দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১৩

গার্মেন্টস কারখানা থেকে চাকরিচ্যুত

শিশু শ্রমিকরা এখন স্কুলে যায়

নিউজ নেটওয়ার্ক/ইউনিসেফ ঃ বাংলাদেশে পোশাক শিল্প-কারখানাগুলো এখন শিশুশ্রমমুক্ত। বাংলাদেশের কোন পোশাক শিল্প-কারখানায় গতকাল থেকে কোন শিশু শ্রমিক কাজ করছে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ১,১৭১টি তৈরী পোশাক কারখানায় পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক নেই।

বিজিএমইএ, আইএলও এবং ইউনিসেফের মধ্যে গত বছর ৪ জুলাই ঢাকায় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী তৈরী পোশাক কারখানায় কর্মরত ১৪ বছরের নীচে শিশু শ্রমিক যাদের অধিকাংশ মেয়ে, শিক্ষাদানের জন্য এক বিশেষ ধরনের স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম বন্ধের ব্যাপারে বাংলাদেশী পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রমশ চাপ আসছিল। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাপের প্রেক্ষিতে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকাস্থ আইএলও পরিচালক পল জে বেইলি বললেন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের আগে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারকদের মধ্যে কিছুটা আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, বাংলাদেশে শিশুশ্রমে প্রস্তুত পোশাক পরিহার করার পক্ষে বিশেষ করে আমেরিকায় ব্যাপকভাবে জনমত সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং সেখানকার ক্রেতারা বাংলাদেশী পোশাক বর্জনের হুমকি দিতে থাকেন। এর ফলে অনেক তৈরী পোশাক কারখানার মালিক শিশু শ্রমিকদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই তাদেরকে ছাঁটাই করে দিতে থাকেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আইএলও এবং ইউনিসেফ দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা শিশু শ্রমিকদের শিক্ষা ও ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে তাদের চাকরিচ্যুত না করার জন্য কারখানা মালিকদের প্রতি আহবান জানান। অবশেষে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত জুলাই '৯৫-তে স্বাক্ষরিত হয় এক ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক।

সমঝোতা স্মারকের মূল দিকগুলো হলো ঃ ১৪ বছর বয়সের নিচে কোন শিশু তৈরী পোশাক কারখানায় কাজ করতে পারবে না, কাজ থেকে ছাঁটাই করা সব শিশু শ্রমিককে তিনশ' টাকা মাসিক ভাতা দিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে, স্কুলের পড়াশুনা শেষ করার পর সকলকে আবার চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। বিজিএমইএ, আইএলও, ইউনিসেফসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা যৌথভাবে এসব স্কুলের খরচ জোগাচ্ছে। সমঝোতা স্মারকের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো-স্কুলে জায়গা না হওয়া পর্যন্ত কোন শিশুকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা যাবে না।

স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা জানার জন্য দেশব্যাপী জরিপ চালানো হয়। জরিপে দেখা যায়, তৈরী পোশাক কারখানাগুলোতে ১৪ বছরের নিচে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১০,৫৪৬ জন। অক্টোবর ২২, ১৯৯৬ পর্যন্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ২২১টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব স্কুলে প্রায় পাঁচ হাজার শিশু শ্রমিককে ভর্তি করা হয়েছে। আইএলও আশা করছে, এই সংখ্যা ছয় হাজার-এ দাঁড়াবে। দু'টি বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) ও গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস) এই স্কুলগুলো পরিচালনা করছে। এ বছর জানুয়ারীতে প্রথম স্কুলটি খোলা হয় ঢাকায়। এসব স্কুলের বেশীরভাগ পরিচালন ব্যয় বহন করছে ইউনিসেফ।

প্রথমদিকে শিশু শ্রমিকরা চাকরি হারিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কেননা, তাদের সবার গড় মাসিক আয় ছিল ৫০০ টাকা। বেতনের বদলে মাসে মাত্র ৩০০ টাকার বৃত্তি অনেক পরিবারের কাছেই অপর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছিল।

এই কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বললেন, "অনেক শিশু শ্রমিকই তাদের রোজগার এরকম হঠাৎ কমে যাওয়ায় বাড়ী যেতে ভয় পেত। কেননা, পরিবারের সদস্যরা তার এই আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাছাড়া রোজগার কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করাও একটা বড় সমস্যা।"

ঢাকায় এ ধরনের বেশ কয়েকটি স্কুল ঘুরে ঘুরে নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা দেখতে পায়, রোজগার কমে যাওয়ায় অনেক শিশু শ্রমিক আফসোস করলেও স্কুলে পড়াশুনা শেষ হলে আবার চাকরি ফিরে পাবে বলে অনেকেই এতে সন্তুষ্ট। শিক্ষকরা জানান, "পরিবার থেকে অন্য কাজে যোগ দেয়ার জন্য চাপ থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।"

কল্যাণপুরে গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস) পরিচালিত এক স্কুলের শিক্ষিকা শাহনাজ বেগম বললেন, "আমার এখানে প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীই স্কুলে পড়াশুনা খুব পছন্দ করছে। তবে অনেকেই আছে, যাদের গরীব বাবা-মা অন্য কাজে যোগ দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি তাদের দোষ দেই না, এত গরীব তারা!"

কল্যাণপুর স্কুলে পড়ে ১৩ বছরের রিনা বেগম। সে বলল, "স্কুলে আসতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমরা অনেক গরীব, পেটে যদি খাওয়া না পাই, তো কিসের কি!" কাজেই একটি তৈরী পোশাক কারখানায় কাজ করে রিনা মাসে বারোশ' টাকা কামাই করত। এখন তার রোজগার অনেক কমে গেছে, তবে রিনা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

রিনার এই স্বপ্ন দেখা একেবারে অবাস্তব কোন কিছু নয়। কেননা, স্কুলে পড়াশুনার পাশাপাশি সে সেলাই ও হস্তশিল্পের কাজ শিখছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি স্কুলে কারিগরি শিক্ষার কর্মসূচীও চালানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য, শিশুরা তাদের হারানো চাকরি ফিরে না পেলেও যাতে রোজগার করে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।